Sanatan Dharma

বীজমন্ত্র দু'ধরনের হয়.

একটি বীজ মন্ত্র (সংস্কৃত: □□□ □□□□□□) ধ্যান বা যোগ অনুশীলনে ব্যবহৃত এক-অক্ষর শব্দ। সংস্কৃত বাক্যাংশ বীজ মন্ত্রের সরাসরি অর্থ, " বীজ মন্ত্র "

বীজমন্ত্র দু'ধরনের হয়। **"ওঁ" দিয়ে যে বীজের শুরু সেগুলো ব্রহ্মবীজ** আর **"হ্রীং" দিয়ে যে বীজগুলো আরম্ভ ওগুলো মায়াবীজ**।

বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে গেলেই শুধু হবে না, গুরু যদি সেই বীজের কার্যক্রম আর মানেগুলো বলে না দেন, তাহলে পাখিপড়া বুলির মতন শুধু বীজ জপই চলবে। চলবে আচমন, ক্রিয়া, পুজো। কিন্তু বীজ কোনওরকম কোনও কাজ করবে না।

গুরু বীজ জাগিয়ে শিষ্যকে দেন। একে বলা হয়, কুঞ্জি দেওয়া। কুঞ্জি হল, চাবির গোছা। শিষ্যের দেহটা চাবি মারা থাকে। গুরু কুঞ্জি দিয়ে তালাটা খুলে দেন। বীজের ভেতরেও একইরকম তালা থাকে। যে গুরু বীজ জাগানোর প্রক্রিয়া না - করেই শুধুই মন্ত্র দিয়ে খালাস, সে মন্ত্রের লক্ষ জপেও কোনও ফল নেই। মন্ত্র কাজ করবে না।

সেজন্যই অধিকারী নির্বিশেষে বীজের বিভাজন আছে। **পুরুষ বীজ**মন্ত্র, স্ত্রীবীজমন্ত্র আর নপুংসক বীজমন্ত্র -- এই তিন ধরনের বীজ আছে।

গুরু যে বীজ দিলেন সে বীজের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ তিনি যদি না - করে দেন, তাহলে সারাজীবন আসনে বসে - বসে বীজ জপ করেও কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি আসবে না।

সেজন্যই বীজের মানে গুরুর কাছে জেনে নিতে হবে। বুদ্ধিমান শিষ্য গুরুকে তাই যাচাই করে নেন।

গুরু যদি জ্ঞানমার্গী না হন, তাহলে শিষ্যের দুর্গতির শেষ নেই।

জ্ঞান কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় জ্ঞান নয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞান দিয়ে ভালো পুজো, হোম করা চলে, কিন্তু জ্ঞান হল এক্ষেত্রে ব্রহ্মোপলব্ধি।

ওঁ হল বিশুদ্ধ নাদ।

মুদ্রা ও বীজমন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি যোগ আছে কুণ্ডলিনীর। ওটা খুলতে সাহায্য করবেন যে গুরু তিনিই সিদ্ধ ।তিনিই জ্ঞানমার্গী। তিনি লাল কাপড় পরে, সিঁদুর লেপে বসে আছেন মায়ের কাছে, না কি তিনি প্যান্ট, টি- শার্ট পরে আছেন সেটা এখানে বিষয় নয়।

জপের আগে মানেটা না জানলে ও বীজ কীভাবে কাজ করবে? গুরু অর্থ ভেঙে, বীজের উৎপত্তি ও বিকাশ শরীরে কীভাবে হচ্ছে সেটা দেখিয়ে দেন। যদি গুরু এ সমস্ত না

Published on: Jan, 02 2024 18:15

দেখিয়ে থাকেন, তবে সারাজীবন ওই মায়ের বীজ নিয়ে পুজো করে যেতে হবে খালি। আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটবে না কোনওভাবে। এজন্যই অনেকে দীর্ঘদিন মন্ত্র নিয়েও কোনও অনুভূতি পান না জীবনে। গুরু বীজ জাগিয়ে দেন না বলে মাতৃকার অনুভূতিটা আসে না।

মন্ত্রের ভেতরেই রয়েছে পুরুষ, প্রকৃতি আর নপুংসক।

যদি মন্ত্রের শেষে " **স্বাহা"** কথাটি জোড়া থাকে গুরু - প্রদত্ত বীজে, তবে ওটা **স্ত্রী-বীজমন্ত্র** ।

মন্ত্রের আগে "**হুঁ** " থাকলে ওটা হল **পুরুষ-**বীজমন্ত্র।
যদি মন্ত্রের শেষে **"নমঃ"** যুক্ত মন্ত্রগুলো **"নপুংসক-**বীজমন্ত্র "।

বলা হয়, --->>>**মন্ত্রবিদ্যা ===**মন্ত্র হল পুরুষ & বিদ্যা হল **স্ত্রী**

মন্ত্রের শুরুতে ওঁ লাগানো যদি থাকে, আর শেষে যদি নমঃ কথাটা থেকে থাকে, তাহলে ওগুলো সব গৃহস্থদের জপের মন্ত্র।

1 অক্ষরের মন্ত্রগুলোই বীজমন্ত্র।
2 অক্ষরের মন্ত্রের নাম, কর্তরীমন্ত্র।
3 থেকে 9 পর্যন্ত অক্ষরের মন্ত্রগুলো হল, বীজকমন্ত্র।
10 থেকে 20 অক্ষরের মন্ত্র হলেই, তখন মালামন্ত্র।

বীজমন্ত্রের মন্ত্রের দু’রকম শক্তি, বাচক ও বাচ্য, প্রথমটি দ্বিতীয়টির স্বরূপ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি জ্ঞাতব্য, প্রথমটি জানার পদ্ধতি। মন্ত্রের বাচক সত্তা বাক্যের দ্বারা গঠিত, বাক্য শব্দের দ্বারা, শব্দ ধ্বনির দ্বারা। ধ্বনির সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পর্যায় দুটির নাম বিন্দু ও নাদ। ধ্বনির প্রকাশ হয় বর্ণে বা অক্ষরে, তাই বর্ণ বা অক্ষরই বীজ। বর্ণই ভাব ও রূপের স্রষ্টা ও তাদের থেকেই সিদ্ধ বীজমন্ত্রের বোধ বা জ্ঞান হয়। বৃহৎ বটবৃক্ষ যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে সেইরূপ সমুদয় তত্ত্ব ওই একাক্ষর বীজের মধ্যে বর্তমান।
বিন্দু হচ্ছে শিবের প্রতীক, বীজ হচ্ছে শক্তির প্রতীক আর নাদ হচ্ছে শিব-শক্তি সামরস্য ।
এই মন্ত্ররহস্য সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সমীকৃত। শিব জ্যোতি বা প্রকাশরূপে বিমর্শস্বরূপ শক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সময় বিন্দুরূপ ধারণ করেন, যার ফলে নাদ বা সূক্ষ্ম শব্দের উৎপত্তি হয়। বিন্দু পুং-বীজ (শুক্র) এবং নাদ স্ত্রী-শক্তি (রজঃ)। এদের মিলনই হচ্ছে কামকলা। বিন্দু বিশ্বজগতের নিমিত্তকারণ, নাদ উপাদানকারণ এবং কামকলা সৃষ্টির পদ্ধতি। দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, মানবিক সৃষ্টিপদ্ধতি কামকলা, জগৎ সৃষ্টির পদ্ধতিও তাই। যদিও চরমতত্ত্বের দিক থেকে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির মত শিব ও শক্তি অভিন্ন, তথাপি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের একটা দ্বৈত ভূমিকা আছে। শিব সৃষ্টির পুরুষ আদর্শ, শক্তি স্ত্রী, উভয়ের মিলন বা কামকলা সৃষ্টির পদ্ধতি। সৃষ্টির প্রকৃতি একটি চক্রের মত যেখানে বার বার অনুবর্তন চলছে। শক্তি তাঁর উৎস থেকে নির্গত হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একটি চক্র সম্পূর্ণ করে আবার তাঁর মূল উৎসে মিলিত হচ্ছেন।

মন্ত্র যেমনটা হোক সেটা কোনও ব্যাপার নয়., আসল হল গুরু ওটা জাগিয়ে দিয়েছেন কিনা কুণ্ডলিনীস্থ চেতনায়।

গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে ওটা জাগাতে হবে আগেভাগে। না হলে পুজো, হোম সব হবে, কিন্তু বীজের শরীরময় স্পন্দনখানি কখনও বোঝা যাবে না।

মন্ত্রের মধ্যে অসাধারণ শক্তি নিহিত থাকে। সুতরাং ‘এই মন্ত্র জপ করিলে কি এরূপ ফল হইতে পারে’ এ প্রকার বিতর্ক বা সংশয় পোষণ করলে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে। এ শ্রেণীর সংশয় সাধককে অধোগামী করে থাকে। শ্রদ্ধা ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সাধনপথে অগ্রসর হলে সাধক অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন।গুরু, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবতার সাথে সাধক আপনার একাত্ম অনুভব করবেন– এটাই সাধনার চরম কথা বলে ।

"ইত্থং মাতা বিদ্যা চক্রং স্বগুরুঃ স্বয়ঞ্চেতি"।

"পঞ্চানামপি ভেদোভাবো মন্ত্রস্য কৌলিকার্থোহয়ম্।।

অর্থাৎ : প্রমাতা (শিব), ইষ্টদেবতা, তাঁর চক্র (মন্ত্র ইত্যাদি) গুরু এবং সাধক এই পাঁচের ভেদোভাব অর্থাৎ অভেদই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ।

মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করতে হলে মন্ত্রচৈতন্য করে এবং মস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হয়েই যথাবিধি জপ করতে হয়। কেননা, মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করতে হলে, মন্ত্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তা সেভাবে জপ করতে হয়। তবেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাবে। তাই কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে–

মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।

ন সিধ্যন্তি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি।। (কুলার্ণবতন্ত্র)

অর্থাৎ : মন্ত্রজপকালে মন, পরম-শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শতকল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। সরস্বতীতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে জগৎগুরু যোগেশ্বর মহাদেব বলছেন–

অন্ধকারগৃহে যদ্বৎ ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।

দীপনীরহিতো মন্ত্রস্তথৈব পরিকীর্তিতঃ।।- (সরস্বতীতন্ত্র-৬/৪)

অর্থাৎ : আলোহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহমধ্যে যেমন কোন বস্তুই প্রতিভাসিত হয় না বা দেখা যায় না, সেইরূপ দীপনীহীন মন্ত্রও তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ হয় না ফলে মন্ত্রজপে কোন ফল হয় না, এমত কথিত হইয়াছে।

এখন মন্ত্রার্থ কী, তা জানা যাক। তন্ত্রমতে মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞানই মন্ত্রার্থ। মন্ত্রার্থ মানে শব্দার্থ নয়। মন্ত্রের ভাবার্থ উপলব্ধি করা শিখতে হবে, এবং তা সাধনসাপেক্ষ। মন্ত্রার্থ প্রসঙ্গে রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—

মন্ত্রার্থ-দেবতারূপ-চিন্তনং পরমেশ্বরি।

বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।।- (রুদ্রযামল)

অর্থাৎ : ইষ্টদেবতার মূর্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন এইরূপ ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবনা হয়। দেবতার রূপচিন্তনই মন্ত্রার্থ। মন্ত্র ও দেবতা বাচ্য-বাচক ভাবে অভিন্ন।

সকল মন্ত্রেই দুইটি শক্তি নিহিত থাকে। একটি বাচ্য শক্তি, অপরটি বাচক শক্তি। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাই মন্ত্রনিষ্ঠ বাচ্য শক্তি এবং মন্ত্রময়ী দেবতাই বাচক শক্তি। বীজ যেরূপ ফলের অন্তরেই নিহিত থাকে, বাচ্য শক্তিও সেইরূপ বাচক শক্তির অন্তর্নিহিত। ফলের বহিরাবরণ ভেদ না করিলে অভ্যন্তরের বীজকে লক্ষ্য করা যায় না, সেইভাবে বাচক শক্তির আরাধনা না করিলে বাচ্য শক্তির স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। বাচ্য শক্তির সামর্থ্যে মন্ত্র জীবিত থাকে এবং বাচক শক্তির সামর্থ্যে রক্ষিত হয়। সুতরাং এই উভয় শক্তির একটিকেও বাদ দিবার উপায় নাই। একটিকে বাদ দিলেই মন্ত্র নির্বীর্য হইয়া যাইবে। মন্ত্রকে অক্ষর-রূপে মনে না করিবার আরও হেতু আছে। অক্ষরাত্মক মন্ত্র শব্দব্রহ্মের প্রতীক মাত্র----অক্ষরজ্ঞান-রূপ সংবিদের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং মহেশ্বর। শব্দ এবং অক্ষরসমূহ তাঁহারই শক্তি। তাঁহাতে অনন্ত শক্তি-বৈচিত্র্যের উদয় এবং লয় হইতেছে। আর অক্ষরসমূহের মধ্যে তদীয় শক্তিত্ব-রূপ একই সাধারণ ধর্ম আছে বলিয়া প্রতীক-রূপ অক্ষরসমূহেরও আত্যন্তিক ভেদ নাই। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বোঝা যায়— প্রণবাদি সকল বীজ মন্ত্রই তাঁহার বাচক। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ স্বীকৃত হয় নাই।’

মন্ত্রে দেবতা মন্ত্রবাচ্যা এবং মন্ত্র দেবতার বাচক, সুতরাং বাচ্য বিজ্ঞাত হলে বাচক প্রসন্ন হন। এভাবে মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হয়ে জপ না করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। তাই সবারই আপন আপন ইষ্টদেবতার, আপন আপন মন্ত্রের অর্থজ্ঞান থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রে মন্ত্রার্থজ্ঞানের এক উৎকৃষ্ট উপায় লিখিত আছে। সে উপায়ে সবাই সকল প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হতে পারেন। তার দ্বারা মন্ত্রের অর্থ আপনিই সাধক-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে ওটা জাগাতে হবে আগেভাগে। না হলে পুজো, হোম সব হবে, কিন্তু বীজের শরীরময় স্পন্দনখানি কখনও বোঝা যাবে না।

Published on: Jan, 02 2024 18:15

Published on: Jan, 02 2024 18:15